

মূল্যবৃদ্ধিতে হাত পুড়ছে জনগণের দায় এড়াচ্ছে সরকার

বিনয়বাবু এমনিতে নরম মেজাজের মানুষ। তবে স্ত্রী ইদানিং লক্ষ করছেন, বাজার থেকে ফিরলেই মেজাজ তাঁর তিরিক্ষি হয়ে থাকে। সে দিন ফরমায়েস মতো অফিস ফেরতা পেঁয়াজ আর চিনি কিনে বাড়িতে ঢুকেই তুলকালাম।

নিউজ চ্যানেলে তখন চলছিল ঘণ্টাখানেকের টক শো। দুম করে বন্ধ করে দেন তিনি। পেঁয়াজের দাম ৬০-৭০ টাকা, চিনির দাম ৭০-৮০ টাকা, গ্যাস হাজার টাকা, সজির দাম

দুয়ের পাতায় দেখুন



সমস্ত বৈধ ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করার দাবিতে ২০ আগস্ট কোচবিহারে বিক্ষোভ। খবর পাঁচের পাতায়

দলের হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদককে গৃহবন্দি করল বিজেপি সরকার

হরিয়ানার বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সৈনী রেওয়ারি শহরে আসবেন। পাছে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষ বিক্ষোভ দেখায়, সেই ভয়ে এসইউসিআই(সি) দলের হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক রাজেন্দ্র সিংকে ৬ সেপ্টেম্বর ভোরবেলা গৃহবন্দি করল পুলিশ। এই নিয়ে ছ-বার পুলিশ তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখল।

এর আগে প্রাক্তন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর রেওয়ারি শহরে এলেই তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হত। প্রশাসন ও পুলিশের এই আচরণ চরম অগণতান্ত্রিক এবং সম্পূর্ণ বেআইনি বলে দলের হরিয়ানা রাজ্য কমিটি এ দিন এক বিবৃতিতে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে রেওয়ারি রেলস্টেশন থেকে এক শিশুকন্যা চুরির ঘটনায় কমরেড রাজেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে তুমুল নাগরিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। যার চাপে পুলিশ সেই শিশুটি সহ আরও ২৩টি শিশুকে উদ্ধার করে। পুলিশ প্রশাসনও তাঁর ভূমিকা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রেওয়ারি শহরে এইমস হাসপাতাল নির্মাণের জন্য তাঁর নেতৃত্বে গণআন্দোলন হয়। রেওয়ারির রামপুর-ভগবানপুরা গ্রামে সিভিল হাসপাতাল নির্মাণের দাবিতে তিনি আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং সেই দাবি আদায় হয়। রেওয়ারি শহরে বেওয়ারিশ গবাদি পশুর হামলায় বহু মানুষের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে। এর প্রতিবাদে মাত্র এক দিন আগে জেলা প্রশাসনের কাছে কমরেড রাজেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা আধিকারিক প্রতিশ্রুতি দেন পরদিন ৬ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী শহরে এলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই দিনই প্রশাসন তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখল।

এই ভাবে গণআন্দোলন এবং নাগরিক আন্দোলনের এক জনপ্রিয় নেতা এবং রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী রাজেন্দ্র সিংকে বারবার গৃহবন্দি করে রাখায় জনমানসে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

কলেজ কমিটির মাথায় বিধায়ক, সাংসদ, দলীয় নেতারা কেন

বিজেপি সরকারের ভোটের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতির অন্তঃসারশূন্যতার আরও এক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করল এ রাজ্যের সরকার পোষিত কলেজগুলি তথা উচ্চশিক্ষা মহল। ২১ আগস্ট এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এ রাজ্যের ২৪৭টি কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি পদে বসানো হল বিজেপি দলের বিধায়ক, সাংসদ, এমকি দলের ব্লক সভাপতিদেরও। সভাপতি পদে বসানো হয়েছে অর্থমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীদেরও। এই পদক্ষেপ এ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে চলমান অরাজকতাকেই আরও পুষ্ট করবে এবং শিক্ষার সুস্থ পরিবেশের আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করবে।

স্বাধিকারের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপ

এই ঘটনা এ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকারের ওপর এক চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ। একটি কলেজের গভর্নিং বডি বা পরিচালন সমিতি গঠিত হয় অধ্যাপক, কর্মচারী, ছাত্র প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে। একটি কলেজের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বডি হিসেবে গভর্নিং বডির গুরুত্ব যথেষ্ট। তাই পরিচালন সমিতিতে কেবল কলেজের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশের

চারের পাতায় দেখুন

এআইডিএসও কর্মীদের উপর এবিভিপি গুন্ডাবাহিনীর নৃশংস হামলা

২ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এআইডিএসও অনুগামী ছাত্রছাত্রীরা অন্যান্য বছরের মতোই এ বারও নবাগত ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিতে সহায়তা

করছিলেন। সঙ্গে দিচ্ছিলেন নেতাজির ছবি সংবলিত গ্রিটিংস কার্ড। ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির জন্য অপেক্ষা করছিলেন যে লেকচার থিয়েটার হলে, সেখানে এবিভিপি কর্মীরা এআইডিএসও ছাত্রকর্মীদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছিল। এআইডিএসও কর্মীরা ডিন এবং প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলে ভেতরে ঢুকলে বহিরাগত কিছু এবিভিপির গুন্ডা

হলের ভেতরে ঢোকে। গুন্ডাদের মধ্যে অভিজিৎ রায় নামে একজন নিজেকে এবিভিপি জেলা সম্পাদক বলে পরিচয় দেয়। তারপর কলেজের প্রাক্তনী ডাঃ রাজ বর্মণ, রজত মজুমদারকে মারতে শুরু করে। এআইডিএসও কর্মীরা অভিযোগ করার জন্য পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়ার সময় গুন্ডারা আবার চড়াও হয়। বেস্ট দিয়ে মারতে থাকে। ডাঃ রাজ বর্মণের ফোন ছিনিয়ে নেয়। তারপর ওই গুন্ডারাই অ্যাডমিশন হলে ঢুকে

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ

হাত দেয়।

৩ সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসের বাইরে কর্মীদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নর্থ বেঙ্গল ডেন্টাল কলেজের প্রাক্তনী ও এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ডাঃ অপূর্ব মণ্ডল, কলেজের সদ্য প্রাক্তনী ডাঃ রামচন্দ্র শর্মা, ডাঃ সুশ্রী সঙ্গীতা জেনা বাতায়ন

চারের পাতায় দেখুন



হামলার প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল। ৫ সেপ্টেম্বর

দিল্লিতে মহিলা সাংবাদিক নিগ্রহ পুলিশের, তীব্র নিন্দা

দিল্লির সাকোত থানায় দুই মহিলা সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা করে এআইএমএসএস-এর সাধারণ সম্পাদক ছবি মহান্তি ৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

দুই সাংবাদিক শাহীনা খান ও নাফিজা খান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে কিছু প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের মাঝেই তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং উভয়কেই মিথ্যা চার্জ দিয়ে মারধর করা হয়। তাঁদের মুসলিম পরিচয় জানতে পেরে আরও মারা হয়। এআইএমএসএস মহিলা সাংবাদিকদের উপর পুলিশি অত্যাচারের, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতদুষ্টতার তীব্র নিন্দা করেছে। নামে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলা হলেও বিজেপি সরকার যে আসলে স্বৈরাচারী, নারীবিরোধী, সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তা আবারও স্পষ্ট হল। সংগঠন অভিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে মহিলা সাংবাদিকদের উপর অত্যাচারের জবাব দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিসর রক্ষা করতে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষকে বিশেষ করে মহিলাদের এগিয়ে এসে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে এআইএমএসএস।

পুনর্বাসন ছাড়া

উচ্ছেদের প্রতিবাদ

কলকাতা কর্পোরেশনের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের গ্যালিফ স্ট্রিট এলাকায় দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের উচ্ছেদের উদ্যোগের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের



উদ্যোগে ২ সেপ্টেম্বর কলকাতা কর্পোরেশনের বরো-১ অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন বাসিন্দারা। প্রতিবাদকারীরা জানান, গত ১৭ ও ৩১ আগস্ট কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে উচ্ছেদের মৌখিক নোটিস প্রচার করা হয়েছে। মোট বয়ে, রিক্সা ভ্যান চালিয়ে বা পরিচারিকার কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করা বহু মানুষ উচ্ছেদের আশঙ্কায় উদ্ভিগ্ন। প্রতিবাদীদের বক্তব্য, 'পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ চলবে না।' তাঁদের বক্তব্য, শহর উন্নয়ন বা সৌন্দর্য্যবোধের নামে গরিব ও প্রান্তিক মানুষের বাসস্থান ও জীবিকার ওপর আক্রমণ চলবে না।

পুরসভায় এ দিন স্মারকলিপি জমা দিয়ে দাবি করা হয়েছে, পুনর্বাসনের বিষয়টি ন্যায্য ভাবে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত উচ্ছেদ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখতে হবে।

মূল্যবৃদ্ধি : দায় এড়াচ্ছে সরকার

একের পাতার পর

৫০ থেকে ১০০, এমনকি ১৫০ টাকা পর্যন্ত হয়ে গেল! ভাবে এরা এ সব নিয়ে? মানুষগুলো বাঁচবে কী করে? মানুষের রোজগার কি বাড়ছে? ও সব সরকার এক। কী হবে এদের কথা শুনে?— গজগজ করতে থাকেন তিনি। বিনয়বাবুর কথাগুলো কিছু অমূলক নয়। ঘরে ঘরে, হাটে-বাজারে কান পাতলে মানুষের এমন রাগ-বিরক্তি-চিৎকার শোনা যায় হামেশাই। লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার সাধারণ মানুষ। সব সরকারই ক্ষমতায় আসার আগে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কথা বলে। ভোট মিটলে কমা দূরে থাক, জিনিসপত্রের দাম লাফিয়ে বাড়িয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ২০২৩ সাল থেকে সভায় সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, 'আমরা কথা দিচ্ছি বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে ৪৫০ টাকায় গ্যাস দেওয়া হবে, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে।' একটা অংশের মানুষ তাঁদের এই প্রতিশ্রুতিতে সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত হয়েছেন, তবে আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছেন— সে সবই কেবল কথার কথা। জীবনযন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষের রাগ বিরক্তি যত্রতত্র ফেটে পড়ছে।

চিনির দাম বৃদ্ধি নিয়ে এখন মানুষের ক্ষোভ তুঙ্গে। পরিসংখ্যান বলছে ২০১৪ সাল থেকে ভারতে আখের উৎপাদন প্রায় ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান আখ ও চিনি উৎপাদনকারী দেশ। মাত্র ৬ মাস আগেও ৭ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি রফতানি করা হয়েছে। তা হলে এখন সরকারকে চিনি আমদানি করতে হচ্ছে কেন? কেমন করে এই ঘটনাটি দেখা দিল? কেন ভারতে চিনির দাম লাফিয়ে বাড়ছে? রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬-এ প্রায় ৩০ লাখ টন আখ ইথানল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়েছে। এটি দেশের মোট চিনি উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশের সমান। বিজেপি-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতি আদানি গোষ্ঠী এবং মন্ত্রীদের পারিবারিক ব্যবসায় বাড়বাড়ন্তের উদ্দেশ্যে পেট্রোলে ইথানল মেশানোর বিষয়ে সরকার ছাড়পত্র দিচ্ছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করেছে, ইথানল উৎপাদন চিনির সংকট ও দামবৃদ্ধির কারণ নয়। তা হলে চিনির দাম বৃদ্ধির কারণ কী? এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনও যুক্তি সরকারের কাছে নেই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে, যে খাদ্য ও পানীয় প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাগুলি মাসে ১০ মেট্রিক টনের বেশি চিনি ব্যবহার করে, তারা ১৫ দিনের বেশি ব্যবহারের উপযোগী চিনি মজুত রাখতে পারবে না। যদিও এই মাস্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি গুদামে মজুত চিনির পরিমাণ কত তার কোনও হিসেব করা হয়নি। অবৈধ মজুত নিয়ে কোনও পদক্ষেপই নেওয়া হয়নি। যে অসঙ্গতিগুলি সামনে আসছে তা থেকে অন্তত এটা বোঝা যায়, মজুতদারি কিংবা ই-২০ পেট্রল— দুই ক্ষেত্রেই লাভবান হচ্ছে বড় পুঁজিপতিরা। দামের বোঝা বইছে জনগণ।

সরকারের হাতে সত্যিই কি দাম নিয়ন্ত্রণের কোনও ক্ষমতা থাকে? যদি কোনও সরকারের উদ্দেশ্য হয় জনকল্যাণ, তবে অবশ্যই ফাটকাবাজি, মজুতদারি বন্ধ করে দাম নিয়ন্ত্রণ করার আইনি ক্ষমতা তার আছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের নিয়ন্ত্রণ মুনাফাবাজদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সরকার চালু করতে পারে। উৎপাদকের কাছ থেকে কিনে সরকার তা সরাসরি জনসাধারণের কাছে বিক্রি করতে পারে। অত্যাব্যবসায়িক পণ্য আইন প্রয়োগ করে কালোবাজারি, মজুতদারি ইত্যাদি যে সব কারণে দাম বাড়ছে তা অচিরেই বন্ধ করা সম্ভব। কিন্তু পুঁজিবাদের স্বাভাবিক নিয়মে আজ বাজারের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করছে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। সরকারগুলি কাজ করে পুঁজিপতিদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসেবে। তাই জনকল্যাণ এদের কাছে বহুদূরের বিষয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করলে বৃহৎ ব্যবসায়ীদের অধিকতর মুনাফার স্বার্থে আঘাত লাগবে। কাজেই আইন থাকলেও আর প্রয়োগ হয় না।

মন্ত্রীরা নাকি বাজারে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন! কিন্তু এ পর্যন্ত কতজনকে তাঁরা শাস্তি দিয়েছেন? ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরো এবং বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অত্যাব্যবসায়িক পণ্য আইনে সাজার হার প্রায় নেই বললেই চলে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০০৯-২০১৪ সময় কালের মধ্যে দেশ জুড়ে প্রায় লক্ষাধিক মামলায় শাস্তি হয়েছে মাত্র ০.১২ শতাংশ ক্ষেত্রে। সম্প্রতি বিজেপি নেতা ও রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ চিনির দাম বৃদ্ধিতে ফাটকাবাজি বা সিভিকিট চক্রের হাত থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন। এ পর্যন্ত একজন ফাটকাবাজকেও তাঁরা চিহ্নিত করে গ্রেফতার করেছেন কি? কেন্দ্র এবং রাজ্য দুই সরকারই তো তাঁদের হাতে! তা হলে সরকার কি সত্যিই দাম নিয়ন্ত্রণ করতে চায়?

মানুষ যখন বাজারে পেঁয়াজ কেনেন ৭০ টাকায়, তা আসলে মাঠ থেকে ওঠার সময়ে ৪-৫ টাকা কেজিতে চাষির কাছ থেকে কিনে মজুত করে রাখা পেঁয়াজ। ১ কেজি চিনি তৈরি হতে প্রায় ১০ কেজি আখ ব্যবহৃত হয়। ১০ কেজি আখের জন্য চাষি পায় ৩৫-৩৬ টাকা। অর্থাৎ মুনাফার আঙুনে ঝলসে যাচ্ছে চাষি এবং সাধারণ ক্রেতা উভয় পক্ষই। ফুলে ফেঁপে উঠছে অল্পসংখ্যক বড় ব্যবসায়ী ও বৃহৎ পুঁজিপতি। সরকারের কাছে জনগণের যে নূনতম প্রত্যাশা তা পূরণ হওয়ারও কোনও সম্ভাবনা নেই। বিনয়বাবুদের মতো সাধারণ মানুষের রাগ তাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘরে কিংবা চায়ের দোকানের উত্তেজনা তো পরিস্থিতি পাল্টায় না! তা হলে যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় কি নেই?

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণ যদি একে অপরের হাত শক্ত করে ধরতে পারেন, ব্যক্তিগত পরিমাণ থেকে বেরিয়ে সোচ্চার প্রতিবাদী স্বরকে আন্দোলনের ময়দানে ধ্বনিত করতে পারেন, তা হলেই এক মাত্র সরকারকে বাধ্য করা যায় মানুষের কথা শুনতে। এ সত্যকে আবার দেখিয়েছে দিল্লির বৃকে আছড়ে পড়া সাম্প্রতিক শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন। সমাধানের এই একমাত্র রাস্তা।

জীবনাবসান

এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর প্রবীণ সদস্য কমরেড সুজাতা রায় ১৩ আগস্ট দীর্ঘ রোগভোগের পর ৭০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যাদবপুর পার্টি অফিসে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস রবি বসু ও প্রদীপ চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।



আশির দশকের শুরুতে কমরেড সুজাতা রায় তাঁর দাদা দলের রাজ্য কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড দীপঙ্কর রায়ের মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা ও আদর্শের সংস্পর্শে আসেন। তৎকালীন রাজ্য কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড সদানন্দ বাগলের সান্নিধ্যে তিনি দলের কাজ শুরু করেন। সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীনতা জনিত সমস্যা ছাড়াও তাঁর একাধিক শারীরিক সমস্যা ছিল। সব প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে দীর্ঘদিন দলের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে তিনি এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দলের মুখপত্র গণদাবী ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা বিক্রি করা, বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার কাজে সহায়তা করা, মনীষী চর্চা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়মিত যুক্ত রেখেছিলেন। খুব ভাল গান গাইতে পারতেন।

এলাকার বহু পরিবারে তাঁর ছিল অবাধ যাতায়াত। কাজের ধারাবাহিকতায় তিনি মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। পাশাপাশি দৃষ্টিহীন মানুষদের সর্বাঙ্গীকরণ বিকাশের লক্ষ্যে গড়ে ওঠা সংগঠনের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সংগঠক। দৃষ্টিহীনদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য ব্রেইল প্রেস নির্মাণের কাজে তাঁর উদ্যোগ ছিল অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টিহীন শিশুদের শিক্ষাদানের মহান ব্রতকে সামনে রেখে উত্তর ২৪ পরগণার শ্যামনগরে 'তরুণ মেমোরিয়াল স্কুল ফর দ্য সাইটলেস'-এর সূচনা পর্ব থেকেই তিনি বিদ্যালয়টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষা রূপে দায়িত্ব পালন করেছেন। যে কোনও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের সমালোচনা, এমনকি তাঁরা বয়সে ছোট হলেও, খোলা মনে গ্রহণ করার চেষ্টা করতেন। পরবর্তীকালে অসুস্থতা জনিত কারণে দলের কাজে সক্রিয় না থাকতে পারার যন্ত্রণা নিয়ে কর্মীদের ও দলের কাজকর্মের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। ২০ আগস্ট শ্যামনগরে দলের পক্ষ থেকে আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নভেন্দু পাল। মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ও দৃষ্টিহীনদের সংগঠনের পক্ষ থেকেও স্মরণসভা হয়। কমরেড সুজাতা রায়ের মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের একজন সাথীকে।

কমরেড সুজাতা রায় লাল সেলাম

সাম্যবাদের মূল নীতি

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস



১৮৪৭ সালে কমিউনিস্ট লিগের প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে একটি কর্মসূচি তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। রচনার দায়িত্ব নেন লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস। প্রথম খসড়াটির নাম রাখা হয়েছিল, ‘কনফেশন অফ ফেথ’। এই খসড়াটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। প্রশ্নোত্তরে লেখা বর্তমান রচনাটি দ্বিতীয় খসড়া রূপে এঙ্গেলস তৈরি করেন। কমিউনিজমের আদর্শকে সহজ ভাষায় বোঝাবার জন্য প্রশ্নোত্তর রূপে লিখলেও, এঙ্গেলস এতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। ১৮৪৭-এর ২৩ নভেম্বর মার্ক্সকে এক চিঠিতে তিনি লেখেন— প্রশ্নোত্তরে লেখাটির উপর একটু ভাবনা-চিন্তা করো। আমার মনে হয়, এ ভাবে চলবে না। ইতিহাসের ঘটনাবলি কিছু যুক্ত করেই এটা দাঁড় করাতে হবে এবং নামও হওয়া উচিত ‘কমিউনিস্ট ইস্তাহার’। ১৮৪৮ সালেই প্রকাশিত হয় মার্ক্স-এঙ্গেলস রচিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার। সুতরাং বর্তমান প্রশ্নোত্তরের লেখাটিকে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের খসড়া হিসাবেই দেখতে হবে। ৫ আগস্ট এঙ্গেলসের ১৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করছি। এ বার ষষ্ঠ কিস্তি।

প্রশ্ন : ব্যক্তিগত মালিকানার চূড়ান্ত অবলুপ্তির ফল কী হতে পারে ?

উত্তর : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ব্যক্তি মালিকের হাত থেকে সমস্ত উৎপাদিকা শক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বণ্টন ব্যবস্থা ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়া। উৎপাদনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার ও সামগ্রী যতটা পাওয়া যাচ্ছে সেই অনুযায়ী সমাজের সকলের প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে উৎপাদিকা শক্তিকে কাজে লাগানো। এর মধ্য দিয়েই বৃহদায়তন শিল্পের বর্তমান কুপ্রভাবগুলি সমাজ থেকে মুছে যাবে। সে দিন সংকটের অবসান ঘটবে। উৎপাদন আরও বাড়বে, যদিও আজকের সমাজব্যবস্থায় বর্ধিত উৎপাদন মানেই অতিউৎপাদন, যা জনগণের চরম দুর্দশার কারণ হয়ে ওঠে। পরবর্তী সমাজে দেখা যাবে এই বর্ধিত উৎপাদনও যথেষ্ট নয়, বরং আরও ক্রমাগত বেশি বেশি করে উৎপাদন বাড়িয়ে চলতে হচ্ছে। বর্ধিত উৎপাদন সেদিন আর দুর্দশার জন্ম দেবে না। সমাজের আশু প্রয়োজন মেটানোর কাজকে ছাপিয়ে অতিউৎপাদন সকলের সব প্রয়োজন মেটানোর দিকে নজর দেবে। এই অগ্রগতি অর্জন করতে গিয়ে জন্ম হবে নতুন নতুন চাহিদা আর তা মেটানোর শক্তির। নতুন অগ্রগতির আবশ্যিক শর্ত এবং কারণ হয়ে উঠবে এই ক্রমবর্ধমান উৎপাদন। তার জন্য, এত দিন যা ঘটে এসেছে তার মতো, সমাজকে বিশৃঙ্খলার পথে ঠেলে দেওয়ার দরকার হবে না। ব্যক্তিমালিকানার জোয়াল থেকে মুক্তি পেলেই বৃহদায়তন শিল্প যে মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে তার পাশে আজকের

বৃহদায়তন শিল্পের আকার নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে পড়বে। যেমন পুরনো ক্ষুদ্র শিল্পকে (ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প) আজকের বৃহদায়তন শিল্পের পাশে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর দেখায়, বিষয়টা তেমনই ঘটবে। শিল্পের এই অগ্রগতি সমাজের হাতে তুলে দেবে প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট দ্রব্যসামগ্রী।

একই ভাবে কৃষিক্ষেত্রেও এখনই যে উন্নত ব্যবস্থাগুলি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে প্রয়োগ করা যেত, ব্যক্তি মালিকানা এবং ছোট ছোট জোতে জমির বিভাজনের চাপে তা আটকে গেছে। এ ক্ষেত্রেও সামাজিক মালিকানা নিয়ে আসবে নতুন উদ্দীপনা, সমাজের হাতে তুলে দেবে বিপুল পরিমাণ উৎপাদন। এ ভাবেই সমাজের সকল সদস্যের সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট উৎপাদন এবং তার বণ্টন সম্ভব হবে। পরস্পর বিরোধী শ্রেণিতে সমাজের বিভাজন এর মধ্য দিয়ে অকার্যকরী হয়ে পড়বে। শ্রেণি বিভাজন শুধু অকার্যকরী হবে তাই নয়, নতুন সমাজ ব্যবস্থার সাথে তা কোনও ভাবেই খাপ খাবে না। শ্রম বিভাজনের ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছিল বিভিন্ন শ্রেণি, সেই শ্রমবিভাগ এতদিন যে আকারে রয়েছে, তা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাবে।

শিল্প এবং কৃষির যে স্তরে উন্নতির কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য শুধু যান্ত্রিক বা রাসায়নিক কুশলতাই যথেষ্ট নয়। যে মানুষ এই কুশলতাকে কার্যকর করবে তাদের যোগ্যতাকেও প্রয়োজনীয় উচ্চতায় বিকশিত করা দরকার। ঠিক যেমন বিগত শতাব্দীতে কৃষক এবং পুরনো ক্ষুদ্র শিল্পের (ম্যানুফ্যাকচারিং শ্রমিক) শ্রমিকদের বৃহদায়তন শিল্পে টেনে আনার পর তারা নিজেদের জীবনযাত্রার আমূল বদল ঘটিয়ে পুরোপুরি নতুন মানুষে পরিণত হয়েছিল। একই ভাবে সমগ্র সমাজের যৌথ পরিচালনায় উৎপাদনের নতুন ধরনের অগ্রগতির জন্য সমাজ তার প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষের সৃষ্টি করবে। যৌথ পরিচালনায় উৎপাদন আজকের সমাজের এই মানুষ দিয়ে চলবে না। তারা আজ উৎপাদনের একটি মাত্র শাখাতেই নিযুক্ত হয়ে তাতেই বাঁধা পড়ে গেছে, তার দ্বারা শোষিত হচ্ছে, তারা নিজেদের সকল যোগ্যতার মূল্যে কেবলমাত্র একটি ক্ষমতার পরিচর্যাতেই ব্যস্ত, তারা গোটা উৎপাদনের কেবল একটি মাত্র শাখা বা কোনও শাখার উপশাখাকেই শুধু জানে, এমন সব মানুষ দিয়ে উৎপাদনের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এমনকি আজকের দিনের শিল্পেও এমন মানুষের প্রয়োজন ক্রমাগত কমছে।

সমাজের সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে

যৌথ মালিকানায় চলা শিল্পের আবশ্যিক শর্ত হল সর্বস্বাধীনভাবে বিকশিত মানুষ, যারা উৎপাদনের পুরো ব্যবস্থাটাকে সামগ্রিকভাবে দেখতে সক্ষম। শ্রম বিভাজনের যে ধাঁচ একজনকে কৃষক, আর একজনকে চর্মকার, তৃতীয়জনকে কারখানা শ্রমিক, চতুর্থজনকে শেয়ার বাজারের দালাল

বানায়, যন্ত্রের ধাক্কায় ইতিমধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত সে ধাঁচ পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। শিক্ষা যুবসমাজকে সামগ্রিক ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে বুঝে নেওয়ার শক্তি দেবে, যাতে তারা সামাজিক প্রয়োজনে বা নিজের আগ্রহের টানে উৎপাদনের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় দ্রুত বিচরণ করতে পারে। বর্তমান শ্রম বিভাজন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর যে একপেশে ভূমিকার তকমা লাগিয়ে দেয় তা থেকে তারা এ পথেই মুক্ত হবে। এই ভাবে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা তার সকল সদস্যকে দেয় তাদের কর্মদক্ষতার সামগ্রিক বিকাশ ও তার পরিপূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণির অবলুপ্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিশ্চিত ভাবে সাম্যবাদী সমাজের গঠনের সাথে শ্রেণির অস্তিত্বই খাপ খায় না, অন্য দিকে এই সমাজের প্রতিষ্ঠাই শ্রেণিগত বিভেদকে পুরোপুরি মুছে ফেলার পথ করে দেয়।

এর থেকে বোঝা যায়, একই ভাবে শহর-গ্রামের বৈপরীত্যও লোপ পাবে। একেবারে পুরোপুরি বস্তুগত কারণেই সাম্যবাদী সমাজ সংগঠনের আবশ্যিক শর্ত হল, দুটি পৃথক শ্রেণির বদলে একই ধরনের জনগণের দ্বারা কৃষি ও শিল্পের পরিচালনা। গ্রামাঞ্চল জুড়ে কৃষিজীবী জনগণের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পাশাপাশি শিল্পে নিযুক্ত জনগণের বড় শহরে ভিড় জমানোর মধ্যে কৃষি ও শিল্পের অনুল্লত দশাই ফুটে ওঠে। এই দশা যে সমাজের আরও অগ্রগতির পথে বাধা ইতিমধ্যেই তা বোঝা যাচ্ছে।

ব্যক্তি সম্পত্তি অবলুপ্ত হওয়ার প্রধান ফলগুলি হল— সমাজের সকল সদস্যের সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির পরিকল্পিত এবং যৌথ ব্যবহার। সকলের প্রয়োজন মেটানো যাবে এমন মাত্রায় উৎপাদনের বিকাশ। যে ব্যবস্থার কারণে সমাজের এক অংশকে বঞ্চিত করার মূল্যে কিছু লোকের সমৃদ্ধি বিধান হয়, তার অবসান। শ্রেণি এবং তার বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের পূর্ণ অবলুপ্তি। এত দিন প্রচলিত শ্রম বিভাজনকে অবলুপ্ত করার মাধ্যমে সমাজের সকল সদস্যের ক্ষমতার সর্বস্বাধীন বিকাশ। এর জন্য কারিগরি শিক্ষা, কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তনের সুযোগ, সকলের প্রচেষ্টায় সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন, শহর

ও গ্রামের সংযুক্তি ঘটানোর ব্যবস্থা।

প্রশ্ন : পরিবার প্রথার উপরে সাম্যবাদী সমাজের কী প্রভাব পড়বে ?

উত্তর : সাম্যবাদী সমাজ নারী-পুরুষের সম্পর্কে করে দেবে একান্ত নিজস্ব বিষয়, কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপার, তাতে সমাজের কোনও হস্তক্ষেপের আবশ্যিকতা থাকবে না। কমিউনিস্ট সমাজ এ কাজ করতে পারে, তার কারণ এই সমাজ ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ করে, শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় সামাজিক তত্ত্বাবধানে। এই ভাবে নিমূল হবে ব্যক্তিসম্পত্তির উপর গড়ে ওঠা এ যাবৎ বজায় থাকা বিবাহ প্রথার দুই মূল স্তম্ভ— স্বামীর উপর স্ত্রীর এবং বাপ-মায়ের উপর সন্তানদের নির্ভরশীলতা। কমিউনিজমে নারীদের ‘যৌথ সম্পত্তি’ করে তোলায় কথা বলে নীতিবাণীশ কুপমভুকেরা যে শোরগোল করে, এটা হল তার একটা জবাব। নারীকে ‘যৌথ সম্পত্তি’তে পরিণত করার বিষয়টি পুরোপুরি বুজিয়ে সমাজেরই অঙ্গ, এখন সেটা নিখুঁত রূপ পেয়েছে পতিতাবৃত্তিতে। যেহেতু পতিতাবৃত্তির মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা, এই মালিকানা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পতিতাবৃত্তিও লোপ পাবে। তাই, সাম্যবাদী সমাজ নারীকে যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত তো করবেই না, বরং তার অবসান ঘটাবে।

প্রশ্ন : বিদ্যমান জাতিসত্তাগুলির প্রতি সাম্যবাদী সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে ?

উত্তর : সম্প্রদায়গত মিলের ভিত্তিতে উদ্ভূত জাতিসত্তাগুলির জনগণ এই সমাজব্যবস্থায় আবশ্যিকভাবেই পরস্পর মিশে যাবে। ভূসম্পত্তি কেন্দ্রিক নানা বিরোধ এবং শ্রেণিগত পার্থক্য তারা দূর করবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের মধ্য দিয়ে।

(মূল খসড়াতে এই জায়গায় লেখা আছে শুধু ‘রিমেইন্স’ অর্থাৎ ‘রয়েছে’। এর উত্তরটি আছে ‘ড্রাফট অফ এ কমিউনিস্ট কনফেশন অফ ফেথ’-এর ২১ নম্বর প্রশ্নে। সেটিই এখানে দেওয়া হল। সূত্র : কার্ল মার্ক্স-ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস কালেক্টেড ওয়ার্কস, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স নিউইয়র্ক, ১৯৭৬)

প্রশ্ন : ধর্মের প্রতি কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে ?

উত্তর : এতদিন পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত ধর্মই কোনও বিশেষ জাতি অথবা জাতিগোষ্ঠীর অগ্রগতির বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্তরের মূর্ত রূপ। কিন্তু সাম্যবাদ হল ঐতিহাসিক অগ্রগতির সেই স্তর, যেখানে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম তার কার্যকারিতা হারিয়েছে এবং তাদের বিলুপ্তির সময় ঘনি়ে এসেছে।

(মূল খসড়াতে এই জায়গাতেও লেখা আছে শুধু ‘রিমেইন্স’ অর্থাৎ ‘রয়েছে’। উত্তরটি আছে ‘ড্রাফট অফ এ কমিউনিস্ট কনফেশন অফ ফেথ’-এর ২২ নম্বর প্রশ্নে। সেটিই এখানে দেওয়া হল। সূত্র : ওই)

(চলবে)

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে মোহনপুর বিডিও-তে বিক্ষোভ

গত এক মাস ধরে দফায় দফায় অতিবৃষ্টি এবং নিকাশির অব্যবস্থাজনিত কারণে পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর ব্লকের পাঁচটি অঞ্চলের আমন ধান, পান ও মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ও পরবর্তী চাষের জন্য কৃষি সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহের দাবিতে অ্যাবেকা মোহনপুর ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ১ সেপ্টেম্বর মোহনপুর বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

এর আগে মিছিল করে মোহনপুর শহর পরিক্রমা করে বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সেখান থেকে তিন শতাধিক গ্রাহক

‘আমি স্মার্ট মিটার চাই না’— এই আপত্তিপত্র নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজারের উদ্দেশ্যে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হন।

বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য দীপক পাত্র, জেলা সভাপতি পূর্ণচন্দ্র পাত্র, ব্লক সভাপতি হিমাংশু



দাস, সম্পাদক কবীন্দ্র সাহু, অফিস সম্পাদক পঙ্কজ ভঞ্জ প্রমুখ। এসএম-কে আপত্তিপত্র দিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গ্রাহকরা জানান, কোথাও স্মার্ট মিটার বসানো যাবে না।

বিধায়ক, সাংসদ, দলীয় নেতারা কেন

একের পাতার পর

প্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদদের নিয়েই এই বডি গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ একটি কলেজের পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন, সামগ্রিক উন্নয়ন এবং তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সামগ্রিক ভাবে কলেজের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেখানে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে, যা আদতে শিক্ষার ক্ষতি করে। স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার পরিবেশ ব্যাপক ভাবে বিঘ্নিত হয়।

অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ

বিজেপি সরকারের এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ তৃণমূলের ধারাবাহিকতাকেই রক্ষা করল। তৃণমূল সরকার ২০১৭ সালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় রেগুলেশন আইন জারি করে কলেজের গভর্নিং বডিগুলিতে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা কমিয়ে সরকার মনোনীত প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়িয়ে আদতে সরকারি নিয়ন্ত্রণের রাস্তা তৈরি করেছিল। এর বিরুদ্ধে শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। বিজেপি সরকার সেই আইনকেই হাতিয়ার করে, আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গভর্নিং বডি তৈরি না করেই কেবল দলের নেতা-মন্ত্রীদের সভাপতি পদে বসিয়ে দিল, যাঁদের মধ্যে অনেকে আবার স্কুলের গাণ্ডি পার হয়ে। উল্লেখ্য, কলেজের গভর্নিং বডির অন্যান্য সদস্য, যেমন— অধ্যাপক, কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী কারওরই নির্বাচন হয়নি। কেবল একজন দলীয় লোককে সভাপতি পদে বসানোর পিছনে বিজেপির উদ্দেশ্য কী? অবশ্যই কলেজগুলিতে দলের নিয়ন্ত্রণ কায়ম করা। এই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কাজের ফলে শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস হবে, নৈরাজ্য বাড়বে। আগের সরকার বছরের পর বছর ছাত্র সংসদের নির্বাচন, গভর্নিং বডির নির্বাচন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সিনেট, সিন্ডিকেট, কোর্ট, কাউন্সিল গঠন বন্ধ রেখেছিল, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাটুটও তৈরি করেনি। বর্তমান সরকার সেই ধারার পরিবর্তনের কথা মুখে বললেও,

কার্যক্ষেত্রে বিগত সরকারের পথ অনুসরণ করেই এগোচ্ছে, যা জনমানসে বিস্ময় ও প্রবল ক্ষোভের সঞ্চার করেছে।

পূর্বতন সিপিএম সরকারের আমলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর দলীয় হস্তক্ষেপ এতটাই প্রবল ছিল যে শিক্ষাক্ষেত্রে দখলদারির সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছিল সিপিএম-এর তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের নাম। সেই আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দারোয়ান থেকে উপাচার্য নিয়োগ, কোনও কিছুই শাসকদলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল না। শিক্ষাদরদি মানুষ তা চাননি। বিগত তৃণমূল সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, বেতন যেহেতু সরকার দেয় তাই তারা সবকিছুতেই নাক গলাবেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে বসানোর আইনও পাশ হয়েছিল বিধানসভায়।

এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বিজেপি সরকার আদতে পূর্বতন সরকারগুলির অনুসৃত অগণতান্ত্রিক পথই অনুসরণ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার রক্ষা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা, মুক্ত চিন্তার পরিসরকে প্রসারিত করা ইত্যাদি ধ্যানধারণার ওপর নগ্নভাবে দলীয় আধিপত্য কায়ম করতে চাইছে।

কেন চাইছে? জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের কমিটি বা পরিচালন বোর্ডে নির্বাচিত শিক্ষক-অধ্যাপক-কর্মচারী-ছাত্র প্রতিনিধির কথা অস্বীকার করেছে। তাই এ রাজ্যের বিজেপি সরকার সভাপতি সহ অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে মনোনীত বডি কলেজগুলিতে চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষাদনে মুক্তচিন্তার কণ্ঠরোধ করতে চাইছে। সেই সঙ্গে বিনা বাধায় শিক্ষার বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ করার পথ প্রশস্ত করতে চাইছে।

এই অবস্থায় রাজ্যের শিক্ষানুরাগী জনগণকে বিজেপি সরকারের এই কালো বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার হতে হবে।

পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের জয়

পাতিয়ালায় পাঞ্জাবি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে হোস্টেলের চার্জ এবং বিভিন্ন কোর্সে বিপুল পরিমাণ ফি বৃদ্ধির ঘোষণা করে। হোস্টেলগুলির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও অন্যান্য দাবিতে এআইডিএসও সহ ৯টি বাম ছাত্র সংগঠন আন্দোলনে নামে ও অবশেষে তা জয়যুক্ত হয়।

কমিটির উদ্যোগে ১২ আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের অফিসের সামনে ২৪ ঘণ্টার অবস্থান-ধরনা শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে দফায় দফায় আন্দোলনকারীদের বৈঠক হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বারবার ফি বৃদ্ধির পক্ষে নিজেদের যুক্তি উপস্থাপন করে আন্দোলনকারীদের কিছুটা ফি-বৃদ্ধি মেনে নিতে বলে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা দৃঢ়ভাবে জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার

জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বর্ধিত ফি আদায় তারা মেনে নেবেনা। বর্ধিত ফি-র ১০০ শতাংশই প্রত্যাহার করতে হবে। ২১ দিন লাগাতার আন্দোলনের চাপে অবশেষে পাঞ্জাবের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ বলবীর সিং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে দীর্ঘ বৈঠক করেন। সেখানে তিনি উপাচার্যের উপস্থিতিতে ছাত্রদের সমস্ত দাবি মেনে নিয়ে



লিখিত আশ্বাস দেন। শুরু থেকেই আন্দোলনে এআইডিএসও-র অবস্থান অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভ

গত এপ্রিল মাস থেকে ১ হাজার টাকা ভাতা বৃদ্ধির সরকারি অর্ডার হলেও কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা সেই টাকা পাচ্ছেন না। রাজ্য সরকার ঘোষণা করা সত্ত্বেও ৫০০০ টাকা ভাতা বৃদ্ধির অর্ডার এখনও আসেনি।

ইস্পেন্টিভের টাকা বকেয়া, মোবাইল বিলের টাকাও এক বছরের বেশি কর্মীরা পাচ্ছেন না। এর সাথে নানা চাপ ও হুমকিতে কর্মীরা বিক্ষুব্ধ ও বিস্কন্ধ। এর প্রতিবাদে এইচ ডব্লিউ ও আশাকর্মীরা ২৫ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী কন্ট্রাকচুয়াল ইউনিয়নের ডাকে কলকাতা কর্পোরেশনে বিক্ষোভ দেখান। প্রায় ৩৫০ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।



পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুনের নেতৃত্বে ১৬ জনের প্রতিনিধি দল কর্পোরেশনের ভেতরে সিএমওএইচ-কে ডেপুটেশন দেন। শেষে কলকাতা কর্পোরেশনের গেট থেকে ধর্মতলা

মেট্রো চ্যানেল পর্যন্ত দৃপ্ত মিছিল হয়। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সভানেত্রী রুনা পুরকাইত, কলকাতা জেলার স্কিম ওয়ার্কার ফেডারেশনের পক্ষে নীলাঞ্জনা কর।

এবিভিপি গুণ্ডাবাহিনীর হামলা

একের পাতার পর

রেস্টুরেন্টে পৌঁছলে আগের দিনের বহিরাগতরা আবার পুলিশের সামনেই হঠাৎ তাঁদের উপর চড়াও হয়। ডাঃ অপূর্ব মণ্ডলের মাথা ফাটিয়ে দেয়। ডাঃ রামচন্দ্র শর্মার গায়ে গরম চা ঢেলে দেয় ও প্রচণ্ড মারধর করে। ডাঃ পৌষালী পাত্র ও ডাঃ সুশ্রী সঙ্গীতা জেনাকেও মারে এবং ধরষণের হুমকি দেয়। যে থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ সহ সমস্ত সাধারণ জনগণ তৃণমূলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল, সেই গুন্ডারাজ, থ্রেট কালচার একই রকম ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়ে আসছে বর্তমান বিজেপি সরকারের ছত্রছায়ায় চলা এবিভিপি। যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সহ একের পর এক প্রতিষ্ঠান দখলের জন্য

দাদাগিরি মারপিট হুমকি চলছে। কিছু দিন আগেও নিউ-ইউজি দুর্নীতির বিরুদ্ধে, এনটিএ বাতিলের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা যখন ক্যাম্পাসে মিছিল করছিলেন তখন বহিরাগত বিজেপির গুন্ডারা তাঁদের আক্রমণ করে। বাস্তবে এআইডিএসও-র উপস্থিতি এবিভিপির র্যাগিং, থ্রেট কালচারে বাধা তৈরি করছে বলেই এই হামলা।

কলেজ কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রশাসনের কাছে এআইডিএসও দাবি করেছে— কলেজে বহিরাগত গুন্ডাদের সম্ভ্রাস বন্ধ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। দোষী বহিরাগতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও ছাত্রদের মতপ্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

বিজেপির জাতীয় শিক্ষানীতির স্বরূপ দেখিয়ে দিচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে ছাত্র আন্দোলন

দিল্লির ঐতিহাসিক ছাত্র-যুব আন্দোলনের পর, সাহসের সঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে আন্দোলন চালিয়ে গেলে যে, দাবি আদায় করা সম্ভব, এই সত্য উপলব্ধি করে এখন দেশের বিভিন্ন রাজ্যের স্কুল পড়ুয়া শিশু-কিশোররাও তাদের স্কুলের সমস্যা নিয়ে একের পর এক দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তুলছে। বিহারের ছাত্র আন্দোলনে ছ'বছরের শিশু আদিত্যের নির্ভীক অংশগ্রহণ ও স্পষ্ট বাচনভঙ্গি দেখে দেশবাসী বিস্মিত। দিল্লির আন্দোলনরত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংবাদমাধ্যমে নাম দেওয়া হয়েছে 'জেন জেড' বা 'জেন জি' এবং স্কুল ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনকে বলা হচ্ছে 'জেন আলফা'র আন্দোলন। মধ্যপ্রদেশেও স্কুল পড়ুয়া এবং বিশেষত ছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুলে গড়ে তুলছে একের পর এক আন্দোলন এবং বহু ক্ষেত্রে দাবি আদায় করে সে সব আন্দোলন বিজয়ীও হচ্ছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী মধ্যপ্রদেশ সরকার রাজ্যের ৫০ শতাংশ স্কুল তুলে দিয়ে সেই সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দূরবর্তী কোনও স্কুলে পাঠিয়ে দিতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই এর ফলে বিশেষত বিপুল সংখ্যক ছাত্রীর পড়াশুনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অভিভাবকরা খরচ এবং নিরাপত্তার কারণে অনেক দূরবর্তী অচেনা জায়গায় মেয়েদের পাঠাতে চাইছেন না। যাঁদের সামর্থ আছে তাঁরা সরকারি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাছাকাছি বেসরকারি স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করছেন। আর অধিকাংশ, যাঁদের আর্থিক সামর্থ নেই, তাঁদের সন্তানদের পড়াশুনাই ছাড়িয়ে দিতে হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর কাছে সরাফা গ্রামের মহারানি লক্ষ্মীবাই গভর্নমেন্ট গার্লস সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলকে এই রকমভাবেই ছয় কিলোমিটার দূরে দাউদখেড়ি গ্রামের একটি স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মধ্যপ্রদেশ শিক্ষা দপ্তর। কিন্তু প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ায় ছাত্রীরাই। ১৪ আগস্ট প্রায় ৩০০ ছাত্রী উজ্জয়িনীর কালেক্টরেট অফিস অভিযান করে প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের নাছোড় আন্দোলনের চাপে স্কুল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়।

১৩ জুলাই ছিদ্রওয়ারা জেলার জঙ্গলমহল তামিয়া তহসিলের অন্তর্গত একলব্য মডেল রেসিডেনসিয়াল স্কুলের ছাত্ররা প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও স্কুলের বাইরে বেরিয়ে এসে বিক্ষোভ দেখায় তাদের অত্যন্ত নিম্নমানের পোকাখরা খাবার দেওয়ার প্রতিবাদে। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন ছত্তরপুর জেলার চান্ডলা এলাকার প্রাইমারি

এবং মিডল স্কুলের ছাত্ররা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল স্কুলের সামনে রাস্তা সারাই এবং স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার দাবিতে। ছত্তরপুরের মহারাজপুর তহসিলের স্কুলছাত্ররাও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়েই দীর্ঘ চল্লিশ কিলোমিটার পথ মিছিল করে তাদের স্কুলের সামনে একটি নালার সংস্কার ও তার ওপর সেতু নির্মাণের দাবি আদায় করে এনেছে। এই আন্দোলনগুলির ধারাবাহিকতায় মধ্যপ্রদেশে গড়ে উঠেছে 'স্কুল বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতি'।

উত্তরপ্রদেশেও বিভিন্ন জায়গায় স্কুল ছাত্ররা আন্দোলনে নেমেছে। রাজধানী লক্ষ্ণৌয়ের জয়প্রকাশ নারায়ণ সর্বোদয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও স্কুলে শূন্যপদে শিক্ষিকা নিয়োগ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে বিশাল মিছিল সংগঠিত করেছে। রাজস্থানের আলওয়ার এবং বারমের জেলা ও বিহারের গয়া জেলাতেও স্কুলছাত্ররা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলেছে। অতীতের কংগ্রেস ও বর্তমান বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলো দীর্ঘদিন ধরেই পুঁজিপতিশ্রেণির শিক্ষাব্যবসার পথ সুগম করার জন্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে ন্যূনতম শিক্ষার আলোটুকুও কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটার পর একটা সুচতুর পদক্ষেপ করে সরকারি স্কুল শিক্ষাব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে চাইছে।

বিজেপি সরকার ২০২০-তে যে জাতীয় শিক্ষানীতি এনেছে তার ফলে স্কুল থেকে শুরু করে উচ্চস্তর পর্যন্ত প্রকৃত শিক্ষা পুরোপুরি ধ্বংস হবে। শিক্ষা হবে কেবলমাত্র পুঁজিপতিদের লাভজনক ব্যবসা, তাদের প্রয়োজনীয় কারিগর তৈরির কর্মসূচি। এই নীতি যেখানেই চালু হচ্ছে সেখানেই দেখা যাচ্ছে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে।

আজকের কিশোর-কিশোরী স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাহসের সাথে একের পর এক আন্দোলন গড়ে তুলছে তা অত্যন্ত আশাপ্রদ। শিক্ষা সহ জনজীবনের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজে যে বিক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে একটার পর একটা আন্দোলনে। ছাত্রছাত্রীদের সাথে অভিভাবকরাও রাস্তায় নামছেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনগুলো যথার্থ সংগ্রামী ছাত্রসংগঠনের পতাকাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে, সরকার বাধ্য হবে শিক্ষাকে বেসরকারি হাতে বেচে দেওয়া ও সাধারণ ঘরের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যথার্থ শিক্ষা কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা বন্ধ করতে।



১ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সহ বামপন্থী দলগুলির সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী মিছিল

অবিলম্বে সরকারি ঘোষণামাফিক ন্যূনতম মজুরি চালুর দাবিতে বিশাল শ্রমিক বিক্ষোভ ব্যাঙ্গালোরে

সরকার-ঘোষিত বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি গত ২২ মে থেকে চালু হওয়ার কথা থাকলেও কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার নানা অজুহাতে এখনও তা চালু করেনি। এর প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি-র ডাকে ব্যাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে ২ সেপ্টেম্বর এক বিক্ষোভ সভায় সমবেত হয়েছিলেন হাজার হাজার শ্রমিক। বিভিন্ন সরকারি দফতর, বোর্ড, কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, বিদ্যুৎ ক্ষেত্র সহ বেশ কয়েকটি শিল্পসংস্থায় কর্মরত দিনমজুর, চুক্তি ও আউটসোর্সড শ্রমিকরা পুঁজিমালিকদের স্বার্থে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি না করার শ্রমিকবিরোধী সরকারি ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ধিকারে ফেটে পড়েন। উচ্চকিত শ্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে সমাবেশস্থল।

বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন এআইইউটিইউসি-র কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কে



সোমশেখর ইয়াদগিরি। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কে সোমশেখর, প্রবীণ সমাজকর্মী উগ্রনরসিমহে গৌড়া, সংগঠনের রাজ্য সহসভাপতি চন্দ্রশেখর মেটি সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। শ্রমিকদের এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আশাকর্মী ইউনিয়ন, মিড-ডে মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কম্পিউটার ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী সমাবেশস্থলে উপস্থিত হলে তাঁর হাতে দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। সমাবেশ থেকে আন্দোলন আরও শক্তিশালী করতে 'ন্যূনতম মজুরি রূপায়ণ অ্যাকশন কমিটি' গঠিত হয়।

এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে আলোচনা সভা

এআইডিওয়াইও-র দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে ৩০ আগস্ট শিলিগুড়ি জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল এক আলোচনা সভা।



অংশগ্রহণকারীদের নানা প্রশ্নের ভিত্তিতে এবং বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-পরিস্থিতির উপর আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মৃদুল সরকার। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় বিশ্বাস ও জেলা ইনচার্জ ধনঞ্জয় রায়।

ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির বিক্ষোভ

২০ আগস্ট কোচবিহার শহরের রামমোহন স্কোয়ারে ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির কোচবিহার মহকুমা শাখার পক্ষ থেকে অবস্থান-বিক্ষোভ হয়। এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নাগরিকদের নাম বিচারাধীন রাখা, ট্রাইবুনালের দীর্ঘসূত্রতা এবং নাগরিক পরিষেবা ও সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্তের প্রতিবাদে ছিল এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। আইনজীবী আসিফ আলমের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধিদল কোচবিহার সদর মহকুমা নির্বাচন আধিকারিক তথা সদর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন।

নেতৃবৃন্দের জোরালো যুক্তির সামনে মহকুমা শাসক বলেন, যাঁরা রেশন পাচ্ছেন না, সেই সমস্ত নাগরিকদের বিষয়টি খাদ্য দপ্তরের মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টা করবেন।

ট্রাইবুনালের আবেদনগুলোর দ্রুত শুনানি ও

নিষ্পত্তি, ফিল্ড ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে সকল প্রকৃত নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, সরকারি প্রকল্প ও নাগরিক পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি বন্ধ করা, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার ও সরকারি গৃহনির্মাণের আটকে থাকা টাকা দ্রুত দেওয়ার দাবি জানানো হয়। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ-এর আহ্বায়ক শিশির সরকার, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নীহার কুমার হোড়, গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা নৃপেন কার্যী, আইনজীবী দিলীপ চন্দ্র বর্মণ, মানবাধিকার কর্মী আব্দুর রউফ আমেদ, পূর্ণ চন্দ্র মণ্ডল, অনিল চন্দ্র রায়, বৈশাখী নন্দী সহ অন্যান্য।

শিশির সরকার দ্রুত ট্রাইবুনালের নিষ্পত্তি ও নাগরিক অধিকার নিয়ে শক্তিশালী নাগরিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সকল মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিদ্রূপ যখন প্রতিবাদের ভাষা

হাজারে হাজারে বিক্ষুব্ধ মানুষ যখন রুটি-রুজির দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে, তখন খুব সহজেই তাদের উপরে লাঠি চালিয়ে বা ডিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে সেই বিক্ষোভকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু শাসক হঠাৎ যদি দেখে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা হাজার হাজার তরুণ-তরুণী তাকে ভয় পাচ্ছে না, বরং এত দিন ধরে তৈরি করা পরম পবিত্র, অজেয় এবং ঐশ্বরিক ভাবমূর্তির বেলুনটাকে স্রেফ কৌতুকবাণে ফুটো করে দিচ্ছে? সে দিনটা শাসকের পক্ষে বড়ই ভয়ঙ্কর।

বিগত কয়েক মাসে এই দৃশ্যেরই মুখোমুখি হতে হয়েছিল এ দেশের শাসকগোষ্ঠীকে। এজলাস থেকে প্রধান বিচারপতি দেশের বেকার যুবসমাজকে তাক্ষিল্য করে ‘ককরোচ’ তথা ‘আরশোলা’ বলে দেগে দিয়েছিলেন— যারা নাকি কোনও রকমের কাজ না থাকায় আন্দোলন করে বেড়ায়। শাসকের মুখে নিরন্তর কটু কথা শুনতেই অভ্যস্ত মানুষজন এ বার আর চুপ করে থাকেনি। ডাক উঠেছিল, জগতের সব ককরোচ এক হও। রাতারাতি তৈরি হয় ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই অবমাননাকর শব্দটি হয়ে উঠল প্রতিবাদের প্রতীক। প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে বিগত এক দশক ধরে নির্মিত শাসকের বিভাজনের ভাষ্যটিকে তারা চরম ব্যঙ্গের খোরাক করে তুলল। আন্দোলনের ধাক্কায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে শাসকের দাপটের বিরুদ্ধে অবাধ্যতার ইতিহাস বেশ পুরনো। আঠেঁরো শতাব্দীর ফরাসি রাজতন্ত্র তার রাজকীয় মহিমা হারিয়েছিল অনেকটাই ‘লিবেল’ পত্রিকার কারণে। সেখানে রানি মেরি আঁতোয়ানেত ও রাজা যোড়শ লুইকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক লেখা সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। সাধারণ শ্রমজীবীদের পোশাক নিয়ে অভিজাতদের তাক্ষিল্যের ‘স্যাঁ-কুলোত’ (পোশাকহীন মানুষ) শব্দটিকে ফরাসি জনতা বুক পেতে নিজেদের আত্মপরিচয় বানিয়েছিল।

২০২২ সালের শ্রীলঙ্কায় চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়, খাদ্য ও জ্বালানি সংকটের জেরে রাজাপক্ষে পরিবারের একচ্ছত্র শাসনের বিরুদ্ধে

আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়। গোটা বায়া রাজাপক্ষের শ্রীলঙ্কাকে দেউলিয়া করার ছবি তুলে ধরে ‘গোটা গো হোম’ জাতীয় অসংখ্য ব্যঙ্গচিত্র তৈরি হয়। গাল ফেস গ্রিনে নির্মিত আন্দোলনস্থলে কার্টুনিস্ট ও শিল্পীরা রাজ পরিবারের দুর্নীতিকে বিদ্রূপ করে বিশাল বিশাল দেওয়াল চিত্র তৈরি করেন। নেপালের সাম্প্রতিক বছরগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনরোষ এবং জেন-জি প্রতিরোধ নেপালের কার্টুন ক্লাবের শিল্পীরা অনলাইনে তুলে ধরেছিলেন তাদের প্রতিবাদী শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলন এবং পরবর্তী কালে স্বৈরাচারী আওয়ামী সরকারের পতনে দেওয়াল চিত্র ও কার্টুন গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। হেলমেট পরা রাষ্ট্রীয় বাহিনী, আয়নাঘর, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা ও অর্থ পাচারকে বিদ্রূপ করে হাজার হাজার ব্যঙ্গাত্মক ছবি তৈরি হয়। আন্দোলনকারীদের ‘রাজাকার’ বলে দেগে দেওয়া হলে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ ‘আমরা সবাই রাজাকার/বলছে কারা— স্বৈরাচার’ বলে সেই নিন্দাবাদ মাথায় তুলে নেয়। স্বৈরাচারী শাসক শেখ হাসিনার লৌহমানবী ভাবমূর্তিটি কৌতুকের হাওয়ার ধাক্কায় টাল খেয়ে যায়।

পিছিয়ে থাকেনি ভারতবর্ষও। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনে কবীর রাজক্ষমতার কৃত্রিম পবিত্রতাকে ভেঙে দিতে গিয়ে উঠেছিলেন— যদি স্নান করলেই মুক্তি মিলত, তবে জলে থাকা মাছই আগে মুক্ত হত। উত্তর ভারতের ব্রিটিশ ও মহাজনবিরোধী কৃষক আন্দোলনে তাদের লোকসঙ্গীত বোলিয়ার মূল ভাষা ছিল বিদ্রূপাত্মক। বছরের বাকি দিনগুলো ভূস্বামীদের চাবুকের ভয়ে কুঁকড়ে-থাকা মেহনতি মানুষ চৈত্র সংগ্রামের গাজনে সঙের নাচ কিংবা কবিগানের আসরে তাদের নামিয়ে আনত রসিকতার পর্যায়ে।

এই জেন-জি আন্দোলনে যুবসমাজ ইতিহাস ও সংস্কৃতির সেই ঐতিহ্যকেই ডিজিটাল মাধ্যমে টেনে এনেছে। সরকার যেখানে আবেদন-নিবেদনের আন্দোলন আশা করেছিল, সেখানে তারা সরকারকে উপহার দিয়েছে এক অপ্রতিরোধ্য অট্টহাসি। কিন্তু গল্প কি এখানেই শেষ? তারুণ্যের এই প্রেরণা-জাগানো সাহস ও সংগ্রামী তেজের

আড়ালে থাকা এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে। প্রতিটা অর্জনের সাথে অবধারিত ভাবেই আসে অর্জনের সীমাবদ্ধতা। আবার সেই সীমাবদ্ধতার কারণ খুঁজে নিয়ে তৈরি হয় পরবর্তী অর্জনের পথ। আজ যখন আন্দোলন কিছুটা ঝিমিয়ে এসেছে, সরকার তখন কী করছে? কোথাও কোনও হইচই না করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে লড়াই তরুণদের। পুলিশি ফাইলে তৈরি হচ্ছে অপরাধীর তালিকা। ঠিক এখানেই প্রকাশ পায় নেতৃত্বহীন, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মূল সীমাবদ্ধতা।

শাসককে ব্যঙ্গ করে তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করা, আর অন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিমূল উপড়ে ফেলা দুটি ভিন্ন বিষয়। জেন-জি আন্দোলনের চাপে একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করে অন্য জন আসতে পারেন। কিন্তু মূল পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ কাঠামো, শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রসার একই থেকে যায়। প্রতিবাদের ভাষা যতক্ষণ ক্ষমতার উঁচু তলার দিকে তাক করা থাকে ততক্ষণ তা আন্দোলনের শক্তিশালী হাতিয়ার। কিন্তু এর পেছনে যদি সমাজমুক্তির দিশা ও উন্নত নৈতিকতা না থাকে, তবে সেই ভাষা কালক্রমে পথ হারিয়ে উগ্র নৈরাজ্যবাদ কিংবা আপসকামিতার রূপ নিতে পারে।

বিদ্যমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চাপে পিষ্ট হতে থাকা শ্রমিক কৃষক এবং দিশেহারা যুব সমাজের জমানো ক্ষোভ মাঝেমাঝেই আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়বে। বারবার গর্জে উঠে বলবে, এই পচে যাওয়া ব্যবস্থার আমূল বদল চাই। কিন্তু শুধু রাজপথের এই স্বতঃস্ফূর্ত উত্তাপ একা কখনওই বদল ঘটাতে পারবে না। কারণ শাসক শ্রেণি অত্যন্ত সুসংগঠিত। তাদের হাতে আছে সশস্ত্র সেনাবাহিনী, পুলিশ, আইনি ছক, প্রশাসন এবং শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যতই প্রবল হোক, তা যদি সংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও নৈতিক বলে বলীয়ান না হয়, কিংবা কার বিরুদ্ধে কেন এই লড়াই— এ সব প্রশ্নে স্পষ্ট দিশা না থাকে, তবে রাষ্ট্র খুব সহজেই এক এক করে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করে বা অন্য কোনও উপায়ে আন্দোলন ভেঙে দেয়। তারা জনগণের ঘাম-রক্তে গড়ে তোলা আন্দোলন হাইজ্যাক করে স্রেফ মুখবদল বা কয়েকটা সাময়িক সংস্কারের আশ্বাস দিয়ে আন্দোলন থামিয়ে দেয়। শোষণের পুরনো কাঠামোটাই থেকে যায়, কেবল

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের মগরাহাট লোকাল কমিটির প্রবীণ নেতা কমরেড সনৎ ব্যানার্জী ২০ জুন বার্ষিক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৯০ বছর বয়সে নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।



ষাটের দশকের শুরুতে মগরাহাট এলাকায় সংগঠন গড়ে তোলার জন্য দলের রাজ্য কমিটি কমরেড মাধব রায়চৌধুরীকে পাঠায়। ওই সময় তাঁর মাধ্যমে কমরেড সনৎ ব্যানার্জী দলের সাথে যুক্ত হন। তখন দলের সহায়-সম্মল পরিচিতি প্রায় কিছুই ছিল না। সেই কঠিন সময়ে এলাকায় দলের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কমরেড সনৎ ব্যানার্জী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

মগরাহাটের লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক ভাগচাষি ও বেনাম জমি উদ্ধার আন্দোলনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, এমনকি কারারুদ্ধও হয়েছিলেন।

কমরেড সনৎ ব্যানার্জী মিস্ত্রীভাষী ও মিত্রভাষী ছিলেন। তাঁর সদা হাস্যময় চারিত্রিক মাধুর্য মানুষকে খুবই প্রভাবিত করত। পরিবারের আর্থিক অনটন থাকলেও দলের প্রয়োজনে শেষ সম্মলটুকুও দিয়ে দিতেন। ছেলেমেয়েদের সর্বদা দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল। জ্ঞানচর্চার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। কমরেড সনৎ ব্যানার্জী শেষ কয়েক বছর শারীরিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। তবে দলের বিশেষ বিশেষ কর্মসূচিতে সব বাধা ঠেলে চলে আসতেন।

২৮ আগস্ট ধামুরা উজান কালচারাল অ্যাকাডেমিতে তাঁর স্মৃতিচারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড সনৎ কুণ্ডু, মাদার নন্দর, বিশ্বনাথ সরদার, গৌরহরি মিস্ত্রী সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও তাঁর গুণমুগ্ধ স্থানীয় মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড সনৎ ব্যানার্জী লাল সেলাম

শিক্ষাক্ষেত্রে আতঙ্কের ছবি

দেশের স্বাধীনতা ৭৯ বছর পার করার পরেও শিক্ষাক্ষেত্রে এ কোন আতঙ্কের ছবি! সংসদে পেশ করা এস্টিমেট কমিটির রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, দেশে ১০০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৭৩ জনই উচ্চমাধ্যমিক পাস করার আগে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। কেন? এর দায় কার?

১২ বছর ধরে কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২১টি রাজ্যে বিজেপির সরকার। গর্ব করে তাঁরা বলেন, ডবল ইঞ্জিন সরকার। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রের এই করুণ হাল তো প্রমাণ করছে এ ইঞ্জিন ডবল হোক বা ট্রিপল— ছুটছে আসলে পিছন দিকে। সমস্ত উন্নয়নের মূলে যে বৌদ্ধিক

জ্ঞান, তা অর্জন করতে হলে প্রথাগত শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে যেতে হয়। কিন্তু দেশের তিন-চতুর্থাংশ ছাত্র যদি শিক্ষার মাঝপথেই ছিটকে যায়, ভারতের পশ্চাৎগতি রুখবে কে?

পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম-শাসনে স্কুলে ড্রপ আউট কমানোর দোহাই দিয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছিল? চালু হয়েছিল অবাধ প্রমোশন নীতি। তারপর ২০০৯-এ কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার শিক্ষার অধিকার আইনের নামে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দিয়েছিল। কেন্দ্রের বিজেপিও এই পথের পথিক। পাশ ফেল বিদায় হল। কিন্তু ড্রপ আউট কমল কি?

ড্রপ আউটের কারণ কী? অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম— তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারগুলিতে রোজগারের দায়িত্ব অল্প বয়সেই কাঁধে এসে পড়ে। আইন যাই থাক, বাস্তবটা অত্যন্ত করুণ। গরিবির সাথে সামাজিক সচেতনতার অভাবেও অল্প বয়সেই একটা অংশের ছাত্রীরা সংসারের যাঁতাকলে আটকে পড়ে। এরই সঙ্গে শিক্ষার পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষকের অভাব, স্কুলের স্বল্পতা, শিক্ষকের পাঠদানে মনোযোগের অভাব— এ সবার পুঞ্জীভূত পরিণাম হল স্কুলছুট। এ ছাড়া শিক্ষায় সরকারি বরাদ্দ খুবই কম। যতটুকু বরাদ্দ হয়, তার সবটা খরচ হয় না। যতটুকু খরচ হয় তা চলে যায় প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক খাতে। বাস্তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে খরচ জোটে সামান্যই। এ দিকে শিক্ষার ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সরকারের পরিকল্পনায় শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ

নীতি, সেল্ফ-ফিন্যান্সিং কোর্স চালু, শিক্ষাকে ছাত্রদের নাগালের বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। শিক্ষার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের দায়িত্ব কি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোর ছিল না? পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে পুরোপুরি অবৈতনিক করা কি যেত না? এর দায় মোদি সরকার এড়াতে কী করে? সম্প্রতি কেন্দ্রের শিক্ষা বিষয়ক কর্তারা আবার বলেছেন, বিনামূল্যে শিক্ষা আদর্শ মডেল নয়। এই যদি তাঁদের মনের কথা হয়, তা হলে ড্রপ আউট কমবে কী করে!

সমস্যার দ্বিতীয় দিকটি হল, শিক্ষান্তে নেই চাকরির কোনও সংস্থান। লক্ষ লক্ষ টাকা

আটের পাতায় দেখুন

ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলের স্থাপত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। যুগ যুগ ধরে বহিরাগত নানা সম্প্রদায় এখানকার সভ্যতায় মিলিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে এই ভারত আজকের ভারত নয়। ভারত বলতে তখন দক্ষিণ-এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত উপমহাদেশ। এই উপমহাদেশীয় সভ্যতার উদারবাদী মানসিকতা তাদের সাদরে গ্রহণ করেছে। এই মিলনের মধ্যে যেমন গ্রিক, শক, ছনের রয়েছে তেমনই রয়েছে ইসলামের অনুসারীরা। সবার মিলনের মধ্যে দিয়ে, সবার সম্মিলিত সাধনার মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছে এখানকার সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য চিত্রকলার উন্নত ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে আজ যে কোনও সম্প্রদায়ের ভারতবাসীই গৌরব অনুভব করার অধিকারী।

দুঃখের বিষয় এই সাধারণ ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী এবং ইংরেজ লেখক তাঁদের জাতিগত অহঙ্কার থেকে ভারতকে হেয় করতে প্রায়ই লিখতেন যে, ভারতবাসীর ধর্ম, সামাজিক অবস্থা এতই নিচুস্তরের যে তারা গণতন্ত্র অথবা স্বাধীনতার অনুপযুক্ত। এরই পাল্টা সমাজের একাংশের মানুষের মধ্যে দেখা দিল— আমাদের কিছুই কি নেই? কিছুই কি ছিল না? তখন তাঁরা মুখ ফেরালেন অতীতের দিকে। বললেন, অতীতে আমাদের সব ছিল। আর অতীত ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা ভারতের মধ্যযুগটিকে টপকে গিয়ে প্রাচীন যুগের কথাই আলোচনা করতেন। মধ্যযুগকে তাঁরা অবক্ষয়ের যুগ বলে দাগিয়ে দিতেন। এই ধারণা অবশ্যই ইতিহাস বিরোধী। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও যুক্তিবাদের বিপরীত ধারার ফসল। যেখানে সভ্যতায় নিজেদের সমাজের অবদানগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করে ঘটতিগুলি বুঝে নিয়ে সেগুলি পূরণের জন্য চেষ্টা করা দরকার ছিল, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার সর্বোচ্চ ভাবনাগুলিকে আয়ত্ত করার দরকার ছিল, তার পরিবর্তে ভারতের অতীত গরিমা স্ফীতাকারে তুলে ধরতে থাকলেন তাঁরা। ফলে সাধারণ দেশবাসীর মনে একটা মিথ্যা দস্ত ও আত্মতুষ্টির মনোভাব তৈরি হল। বাস্তবে তা জাতীয় অগ্রগতি তথা গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা গ্রহণ ও প্রসারের সংগ্রামকেই দুর্বল করে তুলল। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পারসি সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিভেদের মানসিকতাকে বাড়িয়ে তুলল। ইতিহাস হয়ে উঠল এক একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ইতিহাস। মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির এক অংশ হিন্দুদের অনুকরণে তাঁদের ঐতিহ্য চর্চা এবং গর্ববৃদ্ধির জন্য পশ্চিম এশিয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। ক্রমশ দেখা গেল যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পারসি এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে কেউই নিজেদের এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে ভাবছে না, তারা সকলেই নিজেদের এক একটি ভিন্ন ঐতিহ্যের ধারক বা বাহক বলে মনে করতে শুরু করল। এর বিপরীতে নবজাগরণের চিন্তার ভিত্তিতে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ আধুনিক চিন্তা সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছেন। কিন্তু তা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। বাস্তবে জাতীয় কংগ্রেসের

মধ্যযুগের ভারতে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনার উৎকৃষ্ট ফসল

আপসকামী নেতৃত্বের বড় অংশ আধুনিক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার পরিবর্তে হিন্দু বর্ণবাদী চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত থাকার জন্যই এ জিনিস ঘটতে পারল। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তথাকথিত নিম্নবর্ণের ভারতবাসীকে যেমন তাঁরা জাতীয় আন্দোলনে সামিল করতে পারলেন না, তেমনই মুসলিমদেরও বড় অংশকে দূরে ঠেললেন। না হলে মধ্যযুগ জুড়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সুরে কাব্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিত্রকলা, স্থাপত্য ক্ষেত্রে অনন্য সৃষ্টিগুলি কারওর দৃষ্টি এড়াই না। এই

অনৈতিহাসিক চিন্তারই পরিণতিতে সাম্প্রদায়িক এবং বিদ্বেষকে হাতিয়ার করে আজ আবার শাসক বিজেপি মোগল যুগকে ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক থেকে ছেঁটে ফেলছে। যেন মোগল যুগটা সত্যিই ইতিহাসে ছিল না। যেন তারা ছাঁটলেই অন্তত পাঁচশো বছরের ইতিহাস মুছে যাবে। এই বিকৃত ভাবনা নিয়েই নাকি তাঁদের কোনও নেতা বিশ্বগুরু হবেন!

সাহিত্যে সম্মিলন

গোটা মধ্যযুগ জুড়ে অজস্র নিদর্শন রয়েছে যা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, সব কিছুই হিন্দু-মুসলমান মিলিত সাধনার ফলশ্রুতি। সংস্কৃতকে দেবভাষা বলে আখ্যায়িত করেছে হিন্দুদের একাংশ। মধ্যযুগীয় শাসনে সেই সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন দরফা খাঁ ও আবদুর রহিম। ভারতে তুর্কি বা মোগল অভিযানের প্রাথমিক পর্যায়ে পার করে সমাজে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পর সারা দেশের মতো বাংলায়ও সংস্কৃত, লৌকিক পুরাণ ও সাধারণ সাহিত্যের চর্চা সুলতান ও কর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ‘মধ্যযুগের পৌরাণিক বাংলাসাহিত্য প্রধানত রাজসভাশ্রিত।’ বাংলার সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫২৫) দরবারে রূপ, সনাতন, পুরন্দর খাঁ সহ হিন্দু মুসলমান একত্রে শাস্ত্র অনুশীলন ও আলাপ আলোচনা করতেন। তাঁরই আমলে পরাগল খাঁ মুসলমান হয়েও বাংলায় মালাধর বসুকে দিয়ে লিখিয়েছিলেন ‘পরাগলী মহাভারত’। বিপ্রদাস পিপলাই ও বিজয় গুপ্তের বিখ্যাত মনসামঙ্গলও এই সময়েই লেখা হয়। সেই যুগের লেখক কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর মহাভারতের অনুবাদ তাঁরই উৎসাহে। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণেও হুসেন শাহের নাম দেখা যায়। ব্রজবুলি সাহিত্যে বহু মুসলমান পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে কবি মীর মশাররফ হুসেনের নাম উল্লেখযোগ্য।

বহু সংস্কৃত শাস্ত্র ও গ্রন্থ আরব ও পারস্য দেশে আগেই অনুবাদ হয়েছিল। তার পর আল বিরুনি ভারতের ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে চমৎকার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। তার পরেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থের পারসি অনুবাদ হয়েছে। আকবরের সময় নাগেরী মুবারকের পুত্র আবুল ফজল ও ফৈজী অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। সেই যুগে মহাভারত থেকে যোগাবাশিষ্ঠ তাঁর দরবারে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ধর্মের গভীর আলোচনা চলত। তাঁরই

উপনিষদের অনুবাদ সির-ই-আকবর ভাষান্তরিত হয়ে ইউরোপে প্রথম উপনিষদের পরিচয় দিয়েছে।

উত্তর ভারতের সব ভাষার সাহিত্যেই মুসলমানদের সাধনা আছে। ১৫৪০-এ মালিক মুহম্মদ জায়সী তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ পদ্মাবতী লেখেন। কাব্যটির মূল পটভূমি দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ও চিতোরের রানি পদ্মাবতীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও এটি আলাউদ্দিন খিলজির মৃত্যুর (১৩১৬) প্রায় ২২৪ বছর পর শেরশাহ সুরির বাজত্বকালে আওয়াধি ভাষায় রচিত হয়। জায়সীর এই পদ্মাবতী বাংলা অনুবাদ করেন আরাকান রাজসভার প্রতিভাধর কবি সৈয়দ আলাওল। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন ‘লোর-চন্দ্রানী’ উপাখ্যান।

হোলির দিনে ব্রাহ্মণেরা যে মদনাস্তক পাঠ করে, তার রচয়িতা আকবরের সেনাপতি ও মন্ত্রী আবদুর রহিম খান। আকবর বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ে শুধু দীন-ইলাহি ধর্মের প্রবর্তন করেন তাই নয়, তাঁর আদেশে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ পারসি ভাষায় অনূদিত হয়, এই সময়ে ফতেপুর সিক্রির উপাসনালয় এবাদতখানায় সমস্ত ধর্মের প্রধান ও দার্শনিকের মতবিনিময় চলত। ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন, “আকবরই প্রথম মুসলিম সম্রাট যিনি সচেতন ভাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু বাঁধতে চেয়েছিলেন, যদিও তার পিছনে ঐহিক প্রেরণাও ছিল। প্রথমই তিনি তুলে দিলেন জিজিয়া। হিন্দুদের দেওয়া হল বড় বড় মনসবদারি (তার সঙ্গে জায়গীর)। মানসিংহ সাতহাজারি মনসবদার, টোডরমল দেওয়ান, বীরবল প্রিয় সভাসদ। হিন্দুদের সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন, মহাভারত, রামায়ণ, গীতা ফার্সিতে অনুবাদ করালেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মন্দির, মঠের পৃষ্ঠপোষকতাও করলেন।” আকবরের সময়ে গো-হত্যা বন্ধের নির্দেশ ছিল। বেদান্ত চর্চা চলত। তুলসীদাসী রামায়ণ সম্রাট আকবরের আমলেই রচিত হয়। এমনকি কৃন্তিবাসী রামায়ণটিও গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজমশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত বলে একাংশের গবেষকদের মত। সব মিলিয়ে এ কথা স্পষ্ট যে, আজকের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ অনেকাংশেই বাংলার মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত চর্চা

ক্ষিতিমোহন সেনের ‘ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা’ গ্রন্থে পাই : “ভারতের মোল্লা গণ্ডিতের দল যখন বিবাদ করিয়া মরিতেছিল তখনই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল সাহিত্য-কলা-সঙ্গীতে সর্বত্র হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত সাধনা। সঙ্গীতে তো বহু রাগরাগিণী খুসরুর। আমির খুসরু, ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া তানসেন প্রভৃতির ধারা ধরিয়া সঙ্গীতকলার মুসলমান গুণীদেরই জয়জয়কার। এখানকার ধ্রুপদ-খেয়াল টপ্পা-ঠুংরী

সর্ববিধ উত্তর-ভারতীয় সংঙ্গীতকলারই গুরু তাঁহারা।

সেতার যন্ত্রটি হিন্দু-মুসলমান দুই যন্ত্রেরই সমন্বয়ে। এসরাজ সুরবাহার সারেসঙ্গী প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার ফল। তবলাও তাই। রামপুরের নবাব কলব আলি খাঁ সুরশৃঙ্গার প্রবর্তন করেন।

“ইমন ও ইমনযুক্ত সব রাগ মুসলমান গুরুদের প্রবর্তিত। তুরস্কতোড়ি, তুরস্কগৌড়ের নাম সংস্কৃত সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থেও দেখা যায়। ‘তুরস্ক’ নামেই তাহাদের কুল-পরিচয় জানা যাইতেছে। বাহার, আলাইয়া, সরফরদা, সাজগিরি, সাহানা, আড়ানা, সোহিনী, সুহা, সুঘরাই, জিলফ, মারু, পিলু, বারোয়া, লুম, ঝিঝোটি প্রভৃতি রাগ-রাগিণী মুসলমান গুরুদেরই গৌরব। মিঞা-সারঙ্গ মিঞা-মল্লার প্রভৃতিও তাই। মিঞা নামেই তাহাদের পরিচয় সুস্পষ্ট। এগুলি তানসেনের কীর্তি। ...”

“আওরংজেব বাদশাহ হিন্দুস্তানি সঙ্গীত রচয়িতাদেরও যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তাঁহার জন্মদিনে প্রতি বৎসর যে সব নূতন সঙ্গীত রচিত হইয়াছে তাহা আজও তাল-মান সহকারে সুরক্ষিত আছে। ধ্রুপদ একসময় লোকগীত ছিল। ইঁহারাই ইহাকে ক্লাসিকাল বা শাস্ত্রীয় করিয়া তোলেন।”

স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প

স্থাপত্য এবং চিত্রশিল্পেও একই রকম হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনার অজস্র উদাহরণ আছে।

প্রখ্যাত পারস্য পণ্ডিত আল বিরুনির মতে ভারতীয় নৃপতিদের শিল্পকলা ছিল জগতে অতুলনীয়। আরব, তাতার, মোগল, পারস্য শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পীদের কাছে শিক্ষা নিয়েছেন। ব্রিটিশ শিল্প-ইতিহাসবিদ ই ভি হাভেলের মতে, তাজমহল ভারতীয় প্রতিভারই ফল। তাজের ভারতীয়ত্বের একটা বড় প্রমাণ, তাজ পশ্চিমমুখী নয়। আর এফ চিজলম, যিনি একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ স্থপতি এবং ঔপনিবেশিক ভারতে ‘ইন্দো-সারাসেনিক’ স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ বলে পরিচিত, দেখিয়েছেন, তাজের চার কোণে চারটি মিনার, মাঝে গম্বুজযুক্ত রচনা— এই রচনারীতি যুবদীপের চণ্ডীসেবার পঞ্চরত্ন মন্দিরের নকশার সঙ্গে মেলে। হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের পঞ্চরত্ন মন্দিরেরও এইরূপই গঠনপ্রণালী। অজন্তার চিত্রেও তাজের নকশার নমুনা পাওয়া যায়। আকবরের সেকেন্দ্রাতেও এমন সব শৈলী দেখা যায় যাকে ঠিক মুসলমানি বলা যায় না।

তাজের নির্মাণে যেমন কান্দাহার, কনস্টান্টিনোপল ও সমরখন্দের কারিগর ছিলেন, তেমনই মুলতান লাহোরের কারিগরেরও অভাব ছিল না। দিল্লিরও বহু কারিগর ছিলেন। তাঁদের শিক্ষায় ভারতীয় শৈলীই চালু ছিল। একজন বড় ওস্তাদ ছিলেন চিরঞ্জীব লাল, তাঁহার অনুবর্তী ছিলেন ছোটেলাল, মনলাল ও মনোহরলাল।

তাজের পুষ্পিত মোজাইক কাজের ডিজাইনের অনুপ্রেরণা পারস্যের হলেও সে সব রচনার শিল্পী ওস্তাদেরা ছিলেন সবই হিন্দু। তাজের বাগান রচনাও হয়েছিল এক হিন্দু শিল্পীর পরিকল্পনায়।

মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে মূর্তি-চিত্র-গান প্রভৃতি নিষিদ্ধ। তবুও যেমন গানে এই দেশে মুসলমান ওস্তাদেরাই অগ্রণী, তেমনই মোগল আমলে

আটের পাতায় দেখুন

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ও গৃহহীনদের ঘরের দাবিতে

দাঁতন-২ বিডিও-তে বিক্ষোভ

গত দু'মাস ধরে
দফায় দফায় অতিবৃষ্টি
ও নিকাশির
অব্যবস্থাজনিত
কারণে পশ্চিম
মেদিনীপুরের দাঁতন-২
ব্লকের বিস্তীর্ণ



এলাকায় আমন ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দরিদ্র বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ব্যাপক অংশের মানুষও আগে থেকেই গৃহহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। বিডিও-র কাছে আবেদন জানালেও পূর্বতন ও বর্তমান সরকার ঘরের কোনও ব্যবস্থা করেনি। এর মর্মান্তিক পরিণতিতে এ বারের বন্যায় জাহালদায় এক ব্যক্তি ও তাঁর মেয়ে দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে মারা গেছেন।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ও গৃহহীনদের ঘর এবং মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও ঘর দেওয়ার দাবিতে এস

ইউ সি আই (সি) ১৯ আগস্ট দাঁতন-২ ব্লকের বিডিওকে ডেপুটেশন দিতে গেলে বিজেপির গুন্ডাবাহিনী মিছিলের উপর আক্রমণ চালায়। প্রতিবাদে ৪ সেপ্টেম্বর উপরোক্ত দাবিগুলি সহ এলাকায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার দাবিতে খাকুড়া থেকে এক বিশাল মিছিল বিডিও দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য বলরাম দাস, বিয়ুপদ মিশ্র, দীপক পাত্র, জাহালদা লোকাল কমিটির সম্পাদক সুভাষ দাস, হরিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক রাকেশ মাইতি, এআইকেকেএমএস-এর ব্লক সম্পাদক সন্তোষ জানা প্রমুখ। বিডিও দাবি পূরণের আশ্বাস দেন।

পড়ুন

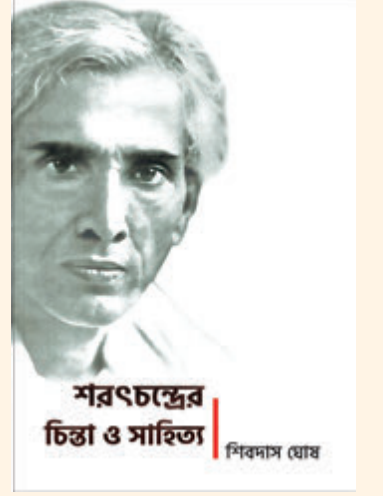
এ যুগের অন্যতম

শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী

চিন্তানায়ক কমরেড

শিবদাস ঘোষের

অন্য আলোচনা



বিদ্রূপ যখন প্রতিবাদের ভাষা

ছয়ের পাতার পর

শাসকের চেয়ারের লোকটা বদলে যায়। কেবল মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আদর্শে বলীয়ান এবং মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানকে যথাযথ প্রয়োগ করতে পারার মতো একটি সংগঠিত শক্তিই এই সুসংগঠিত শোষণব্যবস্থার যথাযথ মোকাবিলা করতে পারে।

সঠিক তত্ত্ব, শৃঙ্খলা এবং সঠিক পথ নিয়ে যতক্ষণ না একটি সঠিক বিপ্লবী পার্টি লড়াইয়ের হাল ধরছে, ততক্ষণ জনরোষের এই প্রকাণ্ড জোয়ার বারবার আসবে, বারবার দিক হারাবে। বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে আবার এক সময় থিতুয়ে আসবে। দিনশেষে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সেই সুযোগে দমনমূলক আইনগুলিকে আরও কড়া করবে। বিশ্বের কোথাও কখনও একটি সঠিক বিপ্লবী পার্টির

দিকনির্দেশনা ছাড়াই একটি বিপ্লব সফল হয়ে গেছে, এমন হয়নি।

আজকের এই সংকটময় সামাজিক পরিস্থিতিতে শ্রেফ ওপর ওপর না বদলে যদি আমূল পরিবর্তন আনতে হয়, তবে একটি আপসহীন, খাঁটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। দিনের শেষে আসল পরীক্ষা তো একটাই— শোষিত জনতা তাদের মুক্তির জন্য সঠিক বিপ্লবী পার্টিকে চিনতে পেরে তার পতাকাতে ঐক্যবদ্ধ হতে পারছে কি না। সেটাই ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রধান শর্ত। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল ইত্যাদি দেশগুলির বিদ্রোহ-পরবর্তী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে আতঙ্কের ছবি

ছয়ের পাতার পর

খরচ করে প্রথাগত শিক্ষা নিয়ে, নানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দক্ষতামূলক শিক্ষা অর্জন করেও যদি চাকরি না হয়, তা হলে? শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষার মর্মবস্তুকে ছেঁতে ফেলা চলছে। শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে তোলা হচ্ছে কর্মসংস্থানকেই। কাজেই কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা না থাকলে শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ তো কমবেই। আজ কলেজগুলির সিংহভাগ আসন ফাঁকা। ইউনিভার্সিটিগুলি ছাত্রশূন্যতায় ভুগছে। এই পরিস্থিতির দায় কার? এই অর্থনৈতিক মডেল, দেশ পরিচালনার এই মডেল কি সাধারণ মানুষের মঙ্গল করতে পারে? যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক মডেল অবৈতনিক শিক্ষার দায়িত্ব বহন করে না, যে অর্থনৈতিক মডেল শিক্ষান্তে সকলের চাকরির ব্যবস্থা করতে পারেনা, সেই অর্থনৈতিক মডেলের প্রতি অনীহা বা অনাস্থা ছাত্র-যুবদের মধ্যে তো বাড়বেই।

এই যে জেন-জি বিক্ষোভ হচ্ছে,

স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হাজার হাজার ছাত্র রাজ্যে রাজ্যে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে— তা কি এমনি এমনি? ক্ষোভের বারুদ তো বুকের ভেতরেই। এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন করতে করতেই জেন-জিদের বিক্ষুব্ধ মন খুঁজবে সমস্যার উৎস কোথায়। সমস্যার উৎস যে বিদ্যমান পুঁজিবাদী আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সমস্যার উৎস যে বৈষম্যবাদী শাসন, সমস্যার উৎস যে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী শাসন— এই যুবকরা আন্দোলনের রক্তভেজা পথ ধরেই তা চিনতে শিখবে। নানা গালমন্দ করে এদের ক্ষোভকে প্রশমিত করা যাবে না। ৭৩ শতাংশ ছাত্র ছাত্রী যে দেশে দ্বাদশের আগে স্কুলছুট হয়ে যায়, সেই দেশের ভবিষ্যৎ কী? স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষে জনগণ তা জানতে চাইবেই। দেশপ্রেম নিয়ে আশ্বাশ্বান করে বিজেপি। প্রকৃত দেশপ্রেমের প্রমাণ দিতে হলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে, যাতে একজন ছাত্রও স্কুলছুট না হয়।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

সাতের পাতার পর

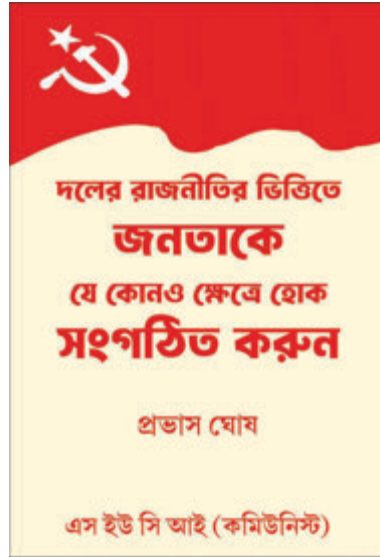
চিত্রশিল্পের বিপুল প্রসার দেখা যায়। মোগল সম্রাটের দরবারে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের চিত্রশিল্পীরাই দেখা পাওয়া যায়। সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ সব চিত্র মেলে পারসিক পুঁথির চিত্রের কাজে। হাজার উপাখ্যান বারো খণ্ডে চোদ্দশো শ্লোকে লেখা। তার মধ্যে রয়েছে অপরূপ সব চিত্র। চাঙ্গেরনামা, জাফরনামা, রজমনামা, পারসি রামায়ণ, পারসি নল-দময়ন্তী কথা, পারসি পঞ্চতন্ত্র, প্রভৃতি পুঁথি এই সব চিত্রের রত্ন-ভাণ্ডার। এই সব শিল্পের রচনার বস্তু নির্বাচনে হিন্দু-মুসলমান কোনও বাছবিচার ছিল না।

আকবরের সময়ের বহু চিত্রশিল্পীর পরিচয় আবুল ফজল রেখে গেছেন। শিল্পীদের মধ্যে চারজনের নাম তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে দুজন মুসলমান দুজন হিন্দু। এ ছাড়াও আরও তেরো জন চিত্রকরের পরিচয় আবুল ফজল দিয়েছেন তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছেন। নন্দলাল বসু মোগল আমলের শিল্পীদের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় প্রখ্যাত একশো আট জন হিন্দু ও একানব্বই জন মুসলমান শিল্পীর নাম।

সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির এই দীর্ঘ ইতিহাস থেকে মুসলিম অবদানকে কি বাদ দেওয়া যায়? বাদ দিলে সত্যিই কি তা আর ইতিহাস থাকে? অথচ আজ ক্ষমতার দস্তে এই চেষ্টাই করে চলেছে শাসক বিজেপি-আরএসএসের নেতারা।

এই সব নবাব-সুলতানদের পরিবর্তে সে দিন যদি আজকের মতো বিজেপি কিংবা আরএসএস ক্ষমতায় বসে থাকত তবে হয়তো এই মিলন সম্ভবই হত না। বিধর্মী বলে তাদের হয়তো 'দূর হটো' বলে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ইতিহাসবিদদেরও এ সব চোখে না পড়ার কথা নয়। তাঁরা যে ইচ্ছা করেই এগুলি দেখেন না বা দেখেও না দেখার ভান করেন, তা বলার অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু যাঁরা বিদ্বৈষে পূর্ণ সমাজের পরিবর্তে একটা সুস্থ-সুন্দর সমাজ দেখতে চান, তাঁরা কি এই বিভেদের রাজনীতিকে নীরবে মেনে নেবেন? শাসকের এই বিকৃত ভাবনাকে নীরব থেকে মেনে নিলে আগামী প্রজন্মের কাছে জবাবদিহি করার কিছু থাকবে কি? (চলবে)

প্রকাশিত হয়েছে সংগ্রহ করুন



- ইলেক্ট্রনিক প্রিন্ট প্রযুক্তি
- গ্রন্থের কী?
- প্রাথমিক শ্রমিক সংগঠন: উন্নয়ন ও বিকাশ
- ভারতবর্ষ ও লাতিন আমেরিকা বিপ্লবের পার্থক্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ
- মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী
- মূলধনের নিয়ম
- শ্রমিক সংগঠন: উন্নয়ন ও বিকাশ
- শ্রমিক সংগঠনের শিক্ষা ও দল গঠন

